হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

কুমারহট্টস্থ, পূর্ণিমা-ব্রত সমিতি দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।

আশ্বিন ১৩০০ সাল।

মূল্য তিন আনা। ডাক মাশুল দুই পয়সা।

ভূমিকা।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে "হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ নব্য ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া, সেই প্রবন্ধটীকে এখন পুস্তকাকারে পরিণত করা হইল। সুবিজ্ঞ হিন্দু মহোদয়গণের সমক্ষে প্রার্থনা এই যে, ইহার শেষভাগে যে প্রস্তাবটী অবতারণা করা হইয়াছে তাহা যেন তাঁহারা মনোযোগের সহিত আলোচনা করেন।

বাবোয়ার, কর্ণাট। শ্রী দী, না, গ।

আশ্বিন, ১৩০০।
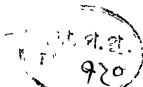
হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার।

আর্য্যদেব ধর্ম্মগত প্রাণ। তাঁহাদের ধর্ম্মে আঘাত লাগিলে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন। প্রাচীন কালে যখন চার্ব্বাক-প্রমুখ নাস্তিকদের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে, ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করিয়া তাহাদের কুতর্কজাল ছিন্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিল, আর্য্যগণ তাঁহাদের প্রিয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল। সুতরাং ইহাকে হীনবল করিবার জন্য বিশেষরূপ আয়োজনের আবশ্যক হইয়াছিল। প্রথমে মহাপণ্ডিত কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। তাহার পর অসামান্য প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্য্য তর্কবলে বৌদ্ধমত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শৈবধর্ম্ম বিস্তার করেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র—অহিংসা পরম ধর্ম্ম—আর্য্যদিগের মধ্যে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল যে, এই মন্ত্রপোষক আর একটী মতের আবশ্যক হইল। অবশেষে রামানুজ আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত এই আচার্য্যদ্বয়ের মতের পোষকতা করিয়া কতকগুলি

পুরাণ প্রকাশ করিলেন। এই সকল গ্রন্থ বহুল রূপে প্রচার হইয়া হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়া ছিল। এতদ্দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, আর্য্যগণ স্বকীয় ধর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিলেও, অপর ধর্ম্মে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যায়। সুতরাং, হিন্দুধর্ম্মে এরূপ ভাব থাকা আশ্চর্য্যজনক নহে। তথাপি আর্য্যদিগের মধ্যে উদারতা আছে। সময়ে সময়ে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া বিরুদ্ধ মত সকল সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরম বৈষ্ণব চৈতন্যদেব আদ্যাশক্তি ও বিষ্ণুর একত্ব দেখাইবার জন্য ব্রজলীলা অভিনয় করিতে করিতে নিজে আদ্যাশক্তির বেশ ধরিয়া সিংহাসনে বিরাজ করিতেন। মহাশাক্ত রামপ্রসাদ সেন ছাগবলি বিরুদ্ধে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্বে শাক্ত ও বৈষ্ণবে মধ্যে মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইত। কিন্তু এখন আর সে ভাব দেখা যায় না। বলিতে কি, কে শাক্ত, কে বৈষ্ণব, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। এক জন আর্য্যকে প্রত্যহ বিষ্ণু ও শিবপূজা করিতে হয়। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যগণ পঞ্চ-উপাসক।

* বৌদ্ধদিগের আন্দোলনের পর খৃষ্টীয় প্রচারকদের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম আঘাত পাইল। কেরি, মার্শম্যান্ এবং ওয়ার্ড

প্রভৃতি প্রচারকগণ বক্তৃতায় ও সাময়িক পত্রিকায় হিন্দুদের ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে ভারত আকাশে একটী মাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র দীপ্তি পাইতে-ছিলেন—ইনি মহাত্মা রামমোহন রায়। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত সমাচারদর্পণে হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইলে, মহাত্মা রামমোহন রায়, "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যায়, তিনি বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে উৎকৃষ্ট ভাব আছে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় পুরাণ ও তন্ত্র প্রতি-পাদিত ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে বিশদ-রূপে দেখাইয়াছেন যে, এক ঈশ্বরের উপাসনা বিধিবদ্ধ করাই হিন্দু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তবে যাঁহারা নিরাকার ভাবে পরমেশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না,—তাঁহাদের জন্যই প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা রামমোহন রায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মের পৌত্তলিকতা বাইবেলের পৌত্তলিকতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, হিন্দুশাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর এক, তবে যাঁহারা তাঁহাকে নিরাকার ভাবে ধারণা করিতে অক্ষম, তাঁহারা কোন প্রতিমা অবলম্বন করিয়া পূজা করিতে পারেন, কিন্তু খৃষ্টীয়ানদের ধর্ম্মশাস্ত্র তিনটী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। দুঃখের বিষয় এই যে, এমন উজ্জ্বল

বক্তকে সে সময়েব হিন্দুগণ চিনিতে পারিল না। তিনি যে প্রকৃত পক্ষে দেশ হিতৈষী ছিলেন, তাহা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিল না। তাঁহার কোন কোন সামাজিক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিযা ঘৃণা করিতে লাগিল। কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে তিনি যে একজন প্রকৃত তত্ত্ব-দর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা আর কোন হিন্দুব প্রতীতি জন্মিল না। ইহা কিছু বিচিত্র নহে। লোকেব তথন শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, সুতরাং, যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম যে কি, তাহা তাহাবা জানিত না, বাহ্য অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের স্থান অধিকাব কবিয়াছিল। ইহার পর, মহামনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব দেখা দিলেন। তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রেব প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তাঁহার যত্নে, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বঙ্গদেশেব প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল। শাস্ত্র সকল বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হওয়াতে, লোকেব তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, এবং পণ্ডিতপ্রবব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রবন্ধাদি লিখিবা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। সে সময়কাব সাময়িক পত্রিকার মধ্যে তত্ত্ব-বোধিনী শীর্ষস্থান অধিকাব কবিল। সুবিজ্ঞ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" "সেকাল আর একাল" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ কবিয়া হিন্দুদিগের কাছে সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের

প্রতি বিলক্ষণরূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন হিন্দুযুবক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল, তখন হিন্দুদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু সমাজের নেতাগণ ভীত হইলেন। পাদরি সাহেবদের তর্কজাল ছিন্ন করিতে পারেন, এমন একজন ধর্ম্মবীরের আবশ্যক হইল—উপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন দেখা দিলেন। তিনি তখন আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদের সহিত ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদিগকে একে একে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। হিন্দু যুবকগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা বুঝিতে পারিয়া আর সে দিকে অগ্রসর হইল না। পাদরি সাহেবেরা উদ্যম ও আশাহীন হইলেন। হিন্দু সমাজের এই মহা উপকার সাধন করাতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দুই হাত তুলিয়া কেশবচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি পণ্ডিত মহাশয়দের এরূপ ভাব অধিক দিন থাকিল না। কেশবচন্দ্র যখন হিন্দুদের আচার ব্যবহারের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিলেন, যখন হিন্দু যুবকগণ আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া, পিতা মাতাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করিল, তখন হিন্দুদের চক্ষু ফুটিল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করায় ও ব্রাহ্ম হওয়ায় কোন প্রভেদ নাই। ক্রমে ব্রাহ্মগণ কিছু বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন। যাঁহারা হিন্দু

পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পৌত্তলিক আত্মীয়দের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কোন প্রকার সাহায্য দান করা ধর্ম্ম-বিগর্হিত বলিয়া স্থির করিলেন। পাছে তাঁহাদের টাকা কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হয়, এই আশঙ্কায় পিতা মাতাকে আনুকূল্য দানে পরাঙ্মুখ হইলেন। এরূপ ব্যবহারে যে হিন্দুগণ ব্রাহ্মদিগকে বিদ্বেষ ভাবে দেখিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। হিন্দুগণ তাঁহাদের খৃষ্টীয়ান পুত্রদের কাছে বরং সাহায্য পাইতে পারিতেন, কিন্তু ব্রাহ্ম পুত্রদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। যদ্যপি ব্রাহ্মগণ জ্ঞানবৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের সমধিক উপকার করিতে পারিতেন। বলিতে কি, তাহা হইলে আর হিন্দুসমাজ কয়েক জন সৎ-পুত্রকে হারাইয়া হীনবল হইত না। তাহা হইলে, ব্রাহ্ম বলিয়া একটী সম্প্রদায় হইত না। সকলেই হিন্দু আখ্যা ধারণ করিতেন। তবে কেহ নিরাকারবাদী হিন্দু, কেহবা সাকারবাদী হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু নূতন ধর্ম্ম নহে। হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহাসাগর মথিত করিয়া এই অমূল্য রত্ন বাহির করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণ ইহাকে বাহ্যানুষ্ঠানের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা প্রকাশ

করিলেন। শাস্ত্রের যাহা আদেশ, রামমোহন রায় তাহাই বিবৃত করিলেন। জ্ঞানীর পক্ষে ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপাসনা, জ্ঞানহীনের পক্ষে কোন প্রতিমা অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা,—শাস্ত্রের ইহাই অভিপ্রায়, এবং রাম মোহন রায় ইহাই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার শিষ্য বলিয়া আপনাদিগের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া, হিন্দু সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিলেন। দুর্ব্বল হিন্দু সমাজকে আরও অধিক বলহীন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে এক জন মহা পণ্ডিত দেখা দিলেন। ইনি সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে এক ঈশ্বরেব উপাসনা প্রচার করিতে লাগিলেন। হিন্দু মাত্রেরই সন্ন্যাসীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে তাহারা সর্ব্বদাই উৎসুক থাকে। সুতরাং পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মুখ নিসৃত কথা শুনিবার জন্য অনেকেই তাঁহার কাছে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের প্রিয় দেবতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন আর তাহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে পারিল না। বিশেষতঃ যখন তিনি তাহাদের পূজ্য গুরু ও পুরোহিত মহাশয়দেব প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের অনুরাগ ঘৃণাতে পরিণত হইল,—তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ

করিতে লাগিল। তবে সরস্বতী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রভাবে কতকগুলি হিন্দু তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল, এবং তাহারা একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। কয়েকটী স্থানে তাঁহার মতাবলম্বীগণ আর্য্যসমাজ নামে সভা প্রতিষ্ঠিত করিল। ধর্ম্মপ্রচারকের ধৈর্য্য থাকা বিশেষ আবশ্যক। অপরের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে হইলে বিনম্র ভাব প্রকাশ করা উচিত। ক্রোধপরায়ণ হইয়া কাহারও প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা অতীব অন্যায়। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, সরস্বতী মহাশয় মধ্যে মধ্যে ক্রোধান্ধ হইয়া বর্ত্তমান আচরিত হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতেন। কেবল নিন্দাবাদ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, হিন্দুগণ যে দেবতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত, সরস্বতী মহাশয় সেই দেবতাকে অতি মন্দ বাক্যে অভিহিত করিতেন। প্রচারকগণ ন্যায়সঙ্গত প্রণালীর দ্বারা অপরের অবলম্বিত মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে কাহারও মনে আঘাত লাগে, এরূপ ভাবে কোন মতের সমালোচনা করা উচিত নহে।

বঙ্গদেশে দয়ানন্দ সরস্বতীর মত অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাহা সমাদর পাইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্য সমাজ উভয়কেই হিন্দুগণ বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। হিন্দুগণকে স্বধর্ম্মপরায়ণ রাখিবার জন্য বঙ্গদেশে চেষ্টা হইল। কলিকাতায় সনাতন ধর্ম্ম-

রক্ষিণী সভা সংস্থাপিত হইল, এবং অন্যান্য স্থানেও এব-প্রকার কয়েকটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। কোন কোন সংবাদপত্র বিশেষতঃ ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা হিন্দু-ধর্ম্মপরিপোষক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিল। এই ভাবে কিছু কাল গত হইল। ক্রমে কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মগণ এবং দয়ানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার শিষ্যগণ অতীব উৎসাহের সহিত নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে অনেক গুলি ব্রাহ্মসমাজ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে কয়েকটী আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হইল। মুঙ্গের ব্রাহ্মদিগের একটী পীঠস্থান হইয়া উঠিল। এইস্থানে ব্রাহ্মগণ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিল। এই আন্দোলনে আমাদের যুবকগণের মতিগতি ফিরিতে লাগিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া তাহারা ব্রাহ্ম-দলভুক্ত হইতে লাগিল। হিন্দুদিগের এ প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া জামালপুরের রেলওয়ে আফিসের এক জন সামান্য কর্ম্মচারীর মন ব্যথিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, হিন্দু-ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে প্রচার না হওয়াতে হিন্দুগণ ধর্ম্ম ও আচার-ভ্রষ্ট হইতেছে এবং প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত না হওয়াতে বর্ত্তমান-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে অসার বিবেচনা করিয়া তাহারা একে একে ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজভুক্ত হইতেছে। এই কর্ম্মচারিটীর বয়ঃক্রম অতি অল্প এবং তাঁহার ক্ষমতাও

অল্প। তাঁহার দ্বারা কি কোন কার্য্য হইতে পারে? কে তাঁহার কথা শুনে, কে তাঁহাকে গ্রাহ্য করে? কিন্তু ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সামান্য সামান্য ব্যক্তির দ্বারাই মহৎ কার্য্য সম্পাদন হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মবলে বলীয়ান, তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য সমাধা না হয়। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার সহায়। এই যুবা পুরুষটীর নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। ইনিই বর্ত্তমান ধর্ম্ম আন্দোলনের মূল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা এস্থলে আবশ্যক হইতেছে।

"সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়"। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, মুঙ্গেরের শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বালক হই-লেও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য গুলি অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইল। আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। কালেক্টারের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুঙ্গেরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ দাস, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাইরাম অগ্নিহোত্রি এবং প্রধান মুনসেফ প্রভৃতি মহোদয়গণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৭৮) মাঘ মাসে, মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন উৎসাহের সহিত হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যমপূর্ণ বক্তৃতা গুলি সুফল উৎপাদন করিতে লাগিল। অনেকের মন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এমন কি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা বিজৃম্ভিত বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাদেরও মন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বিহার প্রদেশে কার্য্যভূমি হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে হিন্দি ভাষায় উপদেশ দিতে হইত। তাঁহার হিন্দি বক্তৃতা এত উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল যে, সে প্রদেশের লোক সকল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার উপদেশ বাক্যগুলি শুনিতে লাগিল। কিছু কাল পরে, কাশিমবাজারের জমীদার রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় আর্য্যসভায় প্রবেশ করিলেন। শুভক্ষণে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের নানাপ্রকার সদ্ভাবপূর্ণ বক্তৃতা এবং চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুশাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায় সম্বন্ধে উপদেশ, হিন্দু সমাজকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। মুঙ্গেরবাসীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল বক্তৃতার দ্বারা কোন স্থায়ী ফল ফলিবে না। যাহাতে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে, তৎপক্ষে তিনি যত্নবান হইলেন। এবং এই নিমিত্ত সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন

করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। মুঙ্গেরের একজন ধনী ব্যক্তি সংস্কৃত বিদ্যালয় ও সভার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্ম তাঁহাকে একটী গৃহ প্রদান করিলেন এবং বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্ম কেহ কেহ অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আরো দেখিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বালকেরা প্রকৃত রূপে উপদেশ পায় না। ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করাতে তাহাদের মধ্যে আর্য্য ভাব স্থান পায় না। বালকদের এই গতি ফিরাইবার জন্ম তিনি একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া এই সভার অধিবেশন হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বালকদিগকে শাস্ত্র-অনুমোদিত নীতিকথা সকল শুনাইতেন। বালকগণকেও প্রতি অধিবেশনে নীতি বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই প্রবন্ধটীর উপর নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন।

একখানি সাময়িক পত্রিকা ব্যতীত উত্তমরূপে ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে না। এই বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ধর্ম্মপ্রচারক নামক বাঙ্গালা ও হিন্দি উভয় ভাষায় লিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৮৬ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে লাগিল। চূড়ামণি মহাশয়ের শাস্ত্রীয় উপদেশও ইহাতে প্রকাশিত হইত। সংসারে

লিপ্ত থাকিলে পাছে ধর্ম্মপ্রচার পক্ষে ব্যাঘাৎ জন্মে, এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিবাহ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার আর একটী বাধা রহিল। ইহা রেলওয়ে কোম্পানির অধীনে চাকরী। সময়ে এ বাধাটীও দূর হইল। তিনি চাকরীটী পরিত্যাগ করিলেন।

এত কাল বিষয় কার্য্য করিতে করিতে যখন অবকাশ পাইতেন, তখন ধর্ম্মসভার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ কালের জন্ম অবসর লইয়া স্থানে স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থে যাত্রা করিতেন। এক্ষণ বিষয় কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে অবসৃত হইয়া অদম্য উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ সুফল প্রসব করিল। যাহারা এতকাল হিন্দুধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্র-অনুমোদিত সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, কোন কোন ব্রাহ্ম পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় লইলেন। স্থানে স্থানে আর্য্য-সভা, হরিসভা ও সুনীতিসঞ্চারিণী সভা সকল সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

পুণ্যভূমি কাশীধাম ধর্ম্মপ্রচারের মূল স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া, এবং তথায় শাস্ত্রাধ্যাপক ও সাধুগণের সাহায্য পাইবার আশায়, ১২৯০ সালের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্যালয় মুঙ্গের

হইতে কাশীধামে লইয়া যাওয়া হইল। মুঙ্গেরের সভাটী শাখা সভারূপে পরিণত হইল। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম সভার সহায়তা করিতে লাগিলেন। পাকুড়ের রাজা মুদ্রা-যন্ত্র ক্রয় করিবার জন্য অর্থ প্রদান করিলেন। কাশীধামে ধর্ম্মামৃত নামে একটী যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইল।

ইহার পর, ১২৯১ সালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়, এবং শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয় কলিকাতায় আগমন করত বক্তৃতা ও উপদেশের দ্বারা নগর আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন। অনেকের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিল। বলিতে কি, লোকের মনের ভাব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ধর্ম্ম কথা ব্যতীত কেহ কোন কথা শোনে না।' ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত কেহ কোন গ্রন্থ পড়ে না এবং যে নাটকে ধর্ম্মঘটিত আখ্যায়িকা নাই, সে নাটকের অভিনয় কেহ দেখে না। সুযোগ পাইয়া, কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মপরিপোষক বক্তৃতাদি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার গ্রন্থকর্ত্তার অভ্যুদয় হইল, যাহারা ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক সকল প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্থির করিলেন এবং রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ নিমাই সন্ন্যাস, বিল্ব-মঙ্গল প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আয় বৃদ্ধিও হইতে লাগিল। যদিও কয়েক জন স্বার্থপর ব্যক্তি দেখা

দিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আন্দোলন হইতে কয়েকটী উত্তম ফল ফলিল। কয়েক জন প্রকৃত দেশহিতৈষী বঙ্গানুবাদ সহ হিন্দু শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বঙ্গবাসী পত্রিকার অধ্যক্ষগণ এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই আন্দোলনের আর একটী ফল এই যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বঙ্কিম বাবু, যিনি উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গবাসীদিগকে মোহিত করিয়াছেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত, ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ নবজীবন ও প্রচার নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হইয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিতে লাগিল।

এই সময়ে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয় এবং নব্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু একত্রিত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে তৎপর হইলেন। উভয়েরই লেখা নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিল। এই মিলন হইতে অনেকেই উৎকৃষ্ট ফল পাইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ আশা ফলপ্রদ হইল না। ইহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। চূড়ামণি মহাশয় এবং তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের মত এই যে, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও রীতি নীতিতে

কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা নাই, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণ প্রাচীন কালের প্রবর্ত্তিত পথ পরিত্যাগ করাতেই হিন্দুসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সেই পথে লইয়া যাওয়া উচিত।” বঙ্কিম বাবু ও তাঁহার মতস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে, কতকগুলি আবর্জ্জনা পড়িয়া ইহাকে মলিন করিয়াছে, ইহা ধৌত করা উচিত। তাঁহারা আরো বলেন যে, যে সকল নিয়ম প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইতে পারে না। তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কিছু দিন পরে বেদব্যাস নামক এক খানি পত্র প্রকাশ আরম্ভ হইল। তাহাতে চূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার সম্বন্ধে এখন কি করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু চূড়ামণি মহাশয় এখনো উপদেশ আদির দ্বারা হিন্দুদিগকে অবলম্বনীয় পথ দেখাইয়া দিতেছেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে দুইটী সভা হইতে দুইটী কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজসাহী ধর্ম্মসভা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ম্লেচ্ছান্ন-ভোজীদের সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করা হয় এবং সেই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সভ্যগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান

জেলার অন্তর্গত দাইহাটস্থিত হরিসভা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় যে, হিন্দুসমাজের বন্ধন দৃঢ় করা উচিত এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পদগৌরব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গবাসী পত্রিকায় এই দুইটী বিষয়ের সমালোচনা হইয়াছিল, এবং ইহার পরিপোষক কয়েকটী প্রবন্ধ তাহাতে প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু আজ কাল সে সম্বন্ধে কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই দুইটী প্রস্তাব কতদূর পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক।

হিন্দু সমাজকে শাসনে রাখা উচিত বটে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কি প্রকার শাসন আবশ্যক? রাজসাহী ধর্ম্মসভার সভ্যগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ম্লেচ্ছ অন্নভোজীদের সহিত আহার ব্যবহার ত্যাগ করিবেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, এ প্রতিজ্ঞাটী রক্ষা করা সম্ভব নহে। আমরা আপনারাই যখন ম্লেচ্ছদের খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করিতেছি, তখন আমরা অপরকে কি প্রকারে শাসন করিব? ভিন্ন দেশজাত দ্রব্য মাত্রই হিন্দুদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু, বিলাতি আলু, কোপী, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতি ত এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে? পূর্ব্বে মুড়ি মুড়কী পাইলেই বালকেরা তুষ্ট থাকিত। এখন পাঁওরুটী বিসকুট নইলে তাহাদের জলখাবার চলেনা। কেবল বালক কেন, বৃদ্ধেরাও এই সকল দ্রব্য পথ্যস্বরূপ

ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন বটে যে, এ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণের দোকানের, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, অনেক স্থলে, ব্রহ্মচারী * কর্তৃক তাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভাল, না হয় স্বীকার করা গেল যে, পাঁও রুটী ও বিসকুট ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করা, কিন্তু সোডা লিমনেড্ বরফ প্রভৃতি যে প্রকাশ্যরূপে হিন্দুসমাজে প্রচলিত। এ সমস্ত যে স্পষ্ট যবন ও ম্লেচ্ছদের হাতের জল।

শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, হিন্দু মাত্রেরই তাহার অনুষ্ঠান করা অনুচিত; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন ব্যবহার শাস্ত্রের শাসন বাক্য অতিক্রম করিয়া অনায়াসে চলিয়া আসিতেছে। পলাণ্ডু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এমন কি, শাস্ত্রে এরূপ শাসন আছে যে, যে ব্রাহ্মণ ইহা ভক্ষণ করিবে, সে পতিত হইবে। পরে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গব্য পান করিলে তবে সে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্য্যন্ত সকলেই পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকে। যবনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত একত্রে বসিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যাইতে পারে। যে স্থানে লৌকিক ব্যব-

* দাড়িওয়ালা মুসলমান।

হার শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়াছে, সে স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? সমাজকে শাসন করিতে হইলে, শাস্ত্রকে, না, প্রচলিত ব্যবহারকে গ্রাহ্য করিতে হইবে?

বর্ত্তমান সমাজে আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য কত শাস্ত্র-অনুজ্ঞা মত আমরা কার্য্য করিতে পারি না। যজ্ঞোপবীত হইবার পর আমাদিগকে অন্যূন নয় বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত শাস্ত্র আলোচনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ পদ্ধতি অনুসারে কে কার্য্য করিয়া থাকে? দুঃখের কথা কি কহিব, যিনি গুরুদেব, তিনিই আপনার পুত্রকে শাস্ত্র আলোচনার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষা শিখাইতেছেন। ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আফিসে চাকরী করেন, তাঁহারা কি প্রকারে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাধা করিতে পারেন?

হিন্দু সমাজের দলপতিগণকে ন্যায় মত বিচার করিতে দেখা যায় না, এবং অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যেও শাস্ত্রীয় কথা সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। যাঁহারা ধনী এবং দেশমান্য, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রবিপরীত কার্য্য করিলেও পতিত হয়েন না, কিন্তু মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের ত্রুটী লইয়া যত আন্দোলন। আবার কতকগুলি অধ্যাপক মহাশয় কোন বিষয় সম্বন্ধে যে প্রকার শাস্ত্রীয় মীমাংসা করেন, অপর

কতকগুলি পণ্ডিত তাহার বিপরীত ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয়, কিন্তু যাঁহারা হোটেলে গিয়া অথবা নিজ বাটীতে বসিয়া বিজাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের প্রতি কেহ লক্ষ্য করে না। তাঁহারা বিশুদ্ধ হিন্দুর ন্যায় সমাজ মধ্যে বিরাজ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক, তাঁহাদিগকেই অত্যাচার করিতে দেখা যায়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি,—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে নানা প্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে, এবং এতদ্দারা সাধারণের যে যথেষ্ট উপকার হইতেছে তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষদের ইহা একটী মহাকীর্ত্তি, এবং এজন্য বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ। কিন্তু আজ কাল যে ভাবে ধর্ম্ম আন্দোলন চলিতেছে, অত্যাচারীদিগকে শাসনে আনিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টিপাৎ করিলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। এই যে শাস্ত্রীয় বাক্য—বেদবাক্য সকল, স্ত্রী, শূদ্র, বলিতে কি, যবন ও ম্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে, ইহা কি হিন্দু ধর্ম্মের অনুমোদিত? অধিক কি বলিব, বৈদিক সন্ধ্যাও তাঁহা-

দের কর্ত্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। ফল কথা এই যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে যাহা প্রচলিত ছিল, তাহা যে আবহমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে, এরূপ হইতে পারে না। অবস্থার পরিবর্ত্তন সহ তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে এপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের পূজনীয় ঋষিগণই কত বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষেরা শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে, স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতিকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করা যে অন্যায়, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। এখন তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে উদারতা দেখান, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আমরা হিন্দুসমাজের শাসন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এখন ব্রাহ্মণদের পদগৌরব রক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিব। এখন প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মণ কে? ইহার প্রকৃত উত্তর এই, যিনি ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। এখন দেখা যাউক, ব্রাহ্মণের কি কি কর্ত্তব্য? পরাশর-নিরূপিত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই জন্য আমরা পরাশর সংহিতাকে অবলম্বন করিব। এই সংহিতায় দ্বিজগণের এই কয়েকটী কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার অর্চ্চনা এবং বৈশ্বদেব ও অতিথির পরিচর্য্যা (১)। ইহাতে

(১) প্রথম অধ্যায় ৩৯ শ্লোক।

ঐইরূপ শাসন বাক্যও আছে, যাঁহারা বৈশ্বদেবের বলি না দিয়া ভোজন করেন, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম নিস্ফল হয়, এবং তাঁহারা নিরয়গামী হয়েন (২)। কদাচারী ব্রাহ্মণকে এক স্থলে চোর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, যথা;—কোন গ্রামে, অনুত্তাচারী ও অধ্যয়নবিহীন দ্বিজগণ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে, রাজা গ্রামস্থ লোকদিগকে দণ্ড দিবেন, যেহেতু তাহারা ভিক্ষা দিয়া চোরকে প্রতিপালন করে (৩)। বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত কর্ত্তব্যগুলি প্রতিদিন সমাধা করেন, এমন ব্রাহ্মণই বা কোথায় এবং কদাচারী বিপ্রগণকে শাসনে রাখেন, এমন দণ্ডকর্ত্তাই বা কে? ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পদযোগ্য কার্য্য করুন। আপামর সাধারণকে সদুপদেশ প্রদান করুন, অবশ্যই তাঁহারা সম্মান লাভ করিবেন।

এখন আর একটী বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক হইয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব কি জাতির উপর নির্ভর করে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন কালের আর্য্য মহানুভবগণ কি বলিয়াছেন, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক—মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির অজগর কর্ত্তৃক প্রদত্ত দুইটী প্রশ্নের এই রূপে উত্তর দিয়াছেন,—

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

(২) প্রথম অধ্যায় ৪৮ শ্লোক।
(৩) প্রথম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।

উত্তর। সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ।

প্রশ্ন। যদি কোন শূদ্রে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেও, কি ব্রাহ্মণ হইতে পারে ?

উত্তর। ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব হইলেই যে কেহ ব্রাহ্মণ হইবে, তাহা নহে, আর শূদ্রবংশে জন্মিলেই যে কেহ শূদ্র হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। কিন্তু যাহাতে উল্লিখিত আচরণ সকল দেখা যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ।

মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্মে বর্ণিত আছে যে, একদা মহর্ষি ভরদ্বাজকে, ব্রহ্মর্ষি ভৃগু বলিয়াছিলেন, হে তপোধন। মনুষ্যলোকে জাতি বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। সমুদায় জগতই ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়া মনুষ্যগণ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব কর্ম্মের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই পর্ব্বের আর এক স্থানে ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুকদেবকে যে উপদেশ দেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই-রূপ বলা হইয়াছে, যাহার মানেও হর্ষ নাই, অপমানেও ক্রোধ নাই এবং যিনি সকল জীবের অভয়দাতা, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি স্তুতি ও নমস্কারে সুখ বোধ করেন না এবং যিনি সকল বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন।

নিরালম্ব উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা ভরদ্বাজ

মুনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কো ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ কে? ইহার প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

এক সময়ে ভৃগুমুনি ভরদ্বাজকে বলিয়াছিলেন,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্‌॥

মহাভারত মো, ধ, ১৪। ১০।

অর্থাৎ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। এই জগতে, পূর্ব্বে সকলেই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা কর্ম্মভেদে নানা বর্ণে পরিণত হইয়াছিল।

এক বর্ণভুক্ত লোকের অন্য বর্ণ প্রাপ্তির পক্ষে বিধিও শাস্ত্রে আছে, যথা :—

শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

মহাভারত মো, ধ, ১৫। ১০।

অর্থাৎ যদ্যপি কেহ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় লক্ষণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে শূদ্র রূপে গণ্য হইবে এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে জন্ম লইয়াও ব্রাহ্মণ-দের লক্ষণযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

> যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
> স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥
>
> মনু, ২। ১৬৮।

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হয়েন, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

> অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
> বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ ॥
> তস্মাদ্‌ বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
> অধ্যেতব্যোঽপ্যেকদেশো যদি সর্ব্বং ন শক্যতে ॥
>
> পরাশর ১২ শ অধ্যায়, ২৯। ৩০।

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা সন্ধ্যা উপাসনা আদি করে না এবং যাহারা বেদপাঠে বিরত, তাহাদিগকে বৃষল বলা যায়। অতএব যাঁহাদের বৃষল হইবার আশঙ্কা আছে, তাঁহাদের উচিত যে সমগ্র বেদ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার একাংশ মাত্রও অধ্যয়ন করেন।

মহাভারতে আছে :—

> জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
> বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

অর্থাৎ জন্মকালে সকলেই শূদ্র থাকে, উপনয়ন আদি সংস্কার হইলে তাহাদের দ্বিজ বলা যায়, বেদ অভ্যাস

ক্ষত্রিলে তাহারা বিপ্র হয় এবং ব্রহ্মকে জানিলে তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়।

অত্রিসংহিতায় আছে :—

> ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
> তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া ব্রহ্মসূত্র ধারণ জন্য গর্ব্বিত, তিনি সেই পাপের নিমিত্ত বিপ্র-পশু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

আমরা দেখিলাম যে যাঁহারা ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল পালন করেন, তাঁহারই ব্রাহ্মণ, এবং যাঁহারা তৎপক্ষে পরাঙ্মুখ তাঁহারা পতিত এবং ব্রাহ্মণোচিত সম্ভ্রম ও বৃত্তি লাভে বঞ্চিত। প্রাচীন কালে রাজশাসন ছিল, সুতরাং কদাচারী দ্বিজগণ যে দণ্ডিত ও সমাজচ্যুত হইতেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া গুণের প্রভাবে উচ্চশ্রেণিভুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে। আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা দেখাইলাম বটে যে, ব্রাহ্মত্ব জাতির উপর নির্ভর করে না এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। এখন দেখা যাউক নিম্ন-শ্রেণীস্থ ব্যক্তি গুণের প্রভাবে উচ্চশ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন কি না।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন কর্ম্ম-তন্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়া ছিলেন, এবং

কবি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থনিরূপক মুনি হইয়াছিলেন। এতদ্‌গ্রন্থের নবম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, দুরিতক্ষয়ের তিন পুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অজমীঢের বংশে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। এই অধ্যায়েতেই আছে যে, মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদ্গল্য গোত্রের উৎপত্তি হয়। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের একবিংশ অধ্যায়ের শেষে বিবৃত হইয়াছে যে, যে বংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপাদক, যে বংশ রাজর্ষিগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত, সেই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক নামক রাজাতেই শেষ হইবে। হরিবংশের অন্তর্গত হরিবংশপর্ব্বের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলেন, কিন্তু কালে তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। শূদ্র জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিও যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। বশিষ্ঠ পত্নী অক্ষমালা এবং কণাদের জননী উলকী পূর্ব্বে শূদ্রা ছিলেন, এবং বলিতে কি, ভগবান ব্যাসদেবের জননী শূদ্রা ছিলেন। যখন পরশুরাম সমুদ্রতীরে বাস করেন তিনি কতকগুলি ধীবরকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উত্তর কোকণে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে এই সকল ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যে কোকণস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত।

শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হওয়াতে যে উচ্চবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে। যথা মনুসংহিতা,—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্ যুগাৎ ॥ ১০ ॥ ৬৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাং তথৈব চ ॥ ১০ ॥ ৬৫

অর্থাৎ বিবাহিতা শূদ্রাতে ব্রাহ্মণের ঔরসজাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণ বিবাহ করে, এবং এই প্রকার ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদ্যপি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্যন্ত চলে, তাহা হইলে সপ্ত জন্ম উপর্যুক্ত পারশবাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষতা জন্য, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং এই পদ্ধতি ক্রমে যেমন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্র হয় এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, প্রাচীন কালে আর্য্যসমাজ অতি উদারভাবে সঞ্চালিত হইত। জাতি বিভাগ অনিষ্টের কারণ না হইয়া সমাজকে পবিত্র ভাবে রক্ষা করিত। যেমন এক দিকে আপন আপন সৎকার্য্যের প্রভাবে হীন জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের অন্তর্গত হইতেন, তেমনি অপর দিকে

ব্রাহ্মণ আদি উৎকৃষ্টবর্ণভুক্ত ব্যক্তিগণ আপন আপন কর্ত্তব্য না করিলে পতিত অথবা হীন জাতি প্রাপ্ত হইতেন। প্রাচীন আর্য্য সমাজে আর একটী উদারভাব দেখা যায়— প্রথম তিনটী বর্ণের মধ্যে আহার ব্যবহার চলিত। ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং ব্রাহ্মণেরাও আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাণ্ডবদের বনবাস কালে দ্রোপদী স্বয়ং রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। এতৎ সম্বন্ধে পরাশর সংহিতায় একটী উদার ব্যবস্থা দেখা যায়, যথা,—

ক্ষত্রিয়োবাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদগৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ ॥ ১১ । ১১ ।

অর্থাৎ যদ্যপি কোন ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য শুদ্ধাচার ও সৎকর্ম্মশীল হয়েন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা সকল সময়ে দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্ম তাহার বাটীতে ভোজন করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের কথা কি কহিব, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই কত দল দেখা যায়।

বঙ্গদেশে রাঢ়া ও বারেন্দ্র নামে তো দুটী প্রধান শ্রেণী আছে। আবার এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত কত বিভাগ আছে। এতদ্ভিন্ন বৈদিক, সপ্তশতী প্রভৃতি কত ছোট ছোট বিভাগ রহিয়াছে। এই সকল বিভাগে তো বঙ্গসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আবার তাহার উপর কৌলীন্য

প্রথা প্রচলিত হইয়া আমাদের দুরবস্থার একশেষ করিয়াছে। একশ্রেণীর কিম্বা এক বিভাগের ব্রাহ্মণ তো অন্য শ্রেণী বা বিভাগের ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিবেই না। দুঃখের কথা কি বলিব, একজন বড় কুলীন ছোট কুলীন কিম্বা কুলহীনের বাটীতে ভোজন করিবে না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেখা যায় যে, তথাকার সমাজ দোষে চোবে প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত এবং এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগের লোকের সহিত ভোজন করে না। বলিতে কি, এ অঞ্চলে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র চৌকা। দাক্ষিণাত্যেও এই ভাব। কোকণস্থ, দেশস্থ প্রভৃতি কয়েকটী ভাগে এখানকার সমাজ বিভক্ত। কিন্তু অন্য প্রদেশ অপেক্ষা আমাদের বাঙ্গালা দেশের অধিক দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে। বড় বড় প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গের কায়স্থগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের এতদূর আধিপত্য যে, তাঁহাদিগকে শূদ্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছে। উপাধির পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, সভাতে তাঁহাদের বসিবার স্থান স্বতন্ত্র হইবে, এবং কোন বাটীতে নিমন্ত্রিত হইলে, ব্রাহ্মণদের ভোজন হইলে পর তাঁহারা ভোজন করিতে পারিবেন। দাক্ষিণাত্য তো বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণে পরিপূরিত—কিন্তু, এখানে এপ্রকার কঠোর নিয়ম নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাক, ব্রাহ্মণগণ এক ঘরে

শূদ্রের সহিত ভোজন করিয়া থাকেন, তবে পঙ্‌ক্তি মাত্র ভেদ—ব্রাহ্মণদের এক পঙ্‌ক্তি এবং শূদ্রদের আর এক পঙ্‌ক্তি। এ অঞ্চলে কত ব্রাহ্মণ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে দেখা যায় না। অবশ্য তাঁহারা শাস্ত্রীদিগের আদেশ মত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এ সম্বন্ধে যে প্রকার উৎপীড়ন হইয়া থাকে, এদেশে তাহার কিছুই দেখা যায় না। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ অতীব সংকীর্ণ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা যে তাঁহারা দেশের অনিষ্টসাধন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। নানা কারণে আমাদের দেশের লোককে ইউরোপ কিম্বা আমেরিকায় যাইতেই হইবে এবং ক্রমে ক্রমে এই সকল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এখন দন্তের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতে পারেন, কিন্তু যখন তাহাদের সংখ্যা অধিক হইবে, তখন তাহারাই হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন। নিম্নবর্ণভুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতিও ব্রাহ্মণ মহাশয়দের উদারতা দেখান উচিত। আজিকাল ব্রাহ্মণেরা আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে বিরত, আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কদাচারী। এ অবস্থায় তাঁহাদের নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের সমক্ষে লজ্জায় মস্তক নত করা উচিত। কিন্তু একপ করা দূরে থাক্, তাঁহারা অপর

জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এবং যদ্যপি কোনরূপে মর্যাদার ত্রুটী হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকে না। তাঁহারা নিজে সম্মান পাইবার যোগ্য নহেন, অথচ অপর কেহ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান না দিলে তাঁহারা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। আর কি বলিব—তাঁহাদের "একটু খানি বিষ নাই কুলা পানা চক্র"। ব্রাহ্মণদের বিবেচনা করা উচিত যে, কায়স্থ ও শূদ্রদের মধ্যে এমন সকল সাধুচেতা লোক আছেন, যাহারা কোন অংশে তাঁহাদের তুলনায় হীন নহেন। এ সকল লোককে দাস আখ্যা দিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা কি ব্রাহ্মণ মহাশয়দের উচিত? এই সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, এবং প্রাচীন কাল হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারে প্রাচীন কালের নিয়ম অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে, এবং সেরূপ চেষ্টা করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাক্, বরং অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু, ব্রাহ্মণদের উচিত যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁহারা ক্রমে ক্রমে উদারতা দেখাইতে যত্নবান হয়েন। সর্ব্ব প্রথমে পুরুষদের নাম হইতে "দাস" এবং রমণীদের নাম হইতে "দাসী" উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এখন দেখা যায়, অনেকে গোপন ভাবে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের বাটীতে জলযোগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার কপটতাচরণের প্রয়োজন

দেখি না। প্রকাশ্য ভাবে ভদ্রলোকের বাটীতে মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এরূপ করিলে আরো উদারতা দেখান হয়, এবং তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন কালে যখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের বাটীতে প্রকাশ্যরূপে ভোজন করিতেন, তখন বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদের বাটীতে "ফলাহার" করা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য বলা যাইতে পারে না। আমরা অবগত আছি যে, ভদ্র কায়স্থ ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদিগকে রীতিমত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং আমরাও আশা করি, তাঁহারা এই প্রকার ব্যবহার করিতে থাকিবেন। যে সকল ব্রাহ্মণ গুণান্বিত, তাঁহারাত গৌরবান্বিত হইবেনই, কিন্তু, যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের ন্যায় গুণসম্পন্ন নাহন, দেশপূজ্য ঋষিগণের বংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহারাও সম্মান পাইবার যোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ের বিবাহপদ্ধতি আমাদের সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিতেছে। প্রাচীন কালে শূদ্রবংশ হইতেও ব্রাহ্মণ আদি শ্রেষ্ঠ বর্ণভুক্ত লোক কন্যা গ্রহণ করিত এবং এই প্রকার বৈবাহিক বন্ধনের জন্য অনেক শূদ্রবংশ ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিলে শুভ ফল না ফলিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত এক শ্রেণীর লোকের অন্য শ্রেণীর লোকের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে

আবদ্ধ হওয়া অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ত দুইটি প্রধান বিভাগ, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র—আছে। আবার এই দুইটি বিভাগের অন্তর্গত কত শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছে। কৌলীন্য প্রথাই বঙ্গীয় সমাজকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া আমাদের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইহা হইতে বহু বিবাহের জঘন্য দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইতেছে—ইহাই শিশুবিবাহ ও কন্যা বিক্রয়কে প্রশ্রয় দিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জঘন্য কৌলীন্য প্রথা শাস্ত্রীয় শাসনকে পদদলিত করিয়া মহা দাম্ভে বিরাজ করিতেছে। শাস্ত্রের শাসন এই যে, পুষ্পবতী কন্যাকে কোন মতেই অবিবাহিতা রাখা যাইতে পারে না, কিন্তু কুলীনগণ অনায়াসেই এ কঠোর শাসনকে অতিক্রম করিতেছেন। এরূপ ত্রুটির জন্য হিন্দুমাত্রকেই কলুষিত হইতে হয়, এবং পাপপথগুন জন্য তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। কিন্তু কুলীন মহাশয়েরা নিরুদ্বেগে কালযাপন করেন, তাঁহারা পবিত্র থাকেন, এবং তাঁহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই। আমাদের সমাজে এই প্রকার বৈষম্য আছে বলিয়াই ত রাজপুরুষেরা আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। এবং এত প্রতিবাদের পরও যে সহবাসসম্মতির আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইল, আমাদের সমাজের শিথিলতা তাহার একটী প্রধান কারণ। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে

দেখিয়া আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, কৌলীন্য প্রথা আর অধিক দিন আধিপত্য করিতে পারিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়েও অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে ইহার বশ্যতা স্বীকার করত ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে দেখা যায়। কুপ্রথার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইহা একবার বদ্ধমূল হইলে ইহাকে উৎপাটিত করা কঠিন হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। সকলে বদ্ধপরিকর হউন। যদ্যপি কৌলীন্য প্রথাটিকে উঠাইতে ইচ্ছা না করেন, ইহাকে সংশোধন করুন। ইহার অন্তর্গত কয়েকটি মেল একত্র করুন এবং যাহাতে বহুবিবাহ প্রভৃতি আমাদের সমাজকে কলুষিত না করে, তৎপক্ষে যত্নবান হউন।

উপরে যাহা বিবৃত করা হইল, তাহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, শাস্ত্রকারগণ সামাজিক নিয়ম সকল অতি উদারভাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তদনুসারে না চলিযাই যত অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছি। আমরা আরো দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রকারগণ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। পরাশর সংহিতা কলিযুগের শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে লিখিত আছে—

ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ। ২ ।২

অর্থাৎ ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্র কৃষি কর্ম্ম করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ যে স্বয়ং ভূমি কর্ষণ করিতে পারেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই এই ব্যবস্থাটী দেখিতে পাই—

স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ২। ৭

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ স্বয়ং ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া স্বোপার্জ্জিত ধান্য দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ করিবে এবং ক্রতুদীক্ষা করাইবে।

কৃষিকার্য্য ব্যতীত ব্রাহ্মণগণ কোন কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধন উপার্জ্জন করিতে পারেন। যথাঃ—

তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্য তৎসমাঃ।
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদিবিক্রয়ঃ ॥ ২। ৮

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের তিল ও রস বিক্রয় করা নিষেধ, কিন্তু, ধান্য ও তাহার সদৃশ দ্রব্য এবং তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন। তাঁহাদের এবম্প্রকার বৃত্তি দূষণীয় নহে।

আজকাল ক্ষেত্র কর্ষণ এবং ধান্য কাষ্ঠাদি বিক্রয় অতি হেয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অর্থ উপার্জ্জন যেরূপ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের সমাজে এ প্রকার সংকীর্ণ ভাব থাকা উচিত নহে। বিশেষতঃ এ কার্য্য যখন শাস্ত্রসম্মত তখন আমাদের ইহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম আলোচনা সম্বন্ধেও শাস্ত্রকারগণ উদারতা দেখাইয়াছেন। যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ে এই মন্ত্রটী আছে ঃ—

যথেমাং বাচং কল্যাণীং মা বদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূ-
দ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চারণায়। প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়া-
সময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু॥

যেরূপ আমি কল্যাণীয় অর্থাৎ ঐহিক ও পার ত্রিক বিষয়ের সুখকর ঋগ্বেদাদি চারি বেদের পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তদ্রূপ হে মনুষ্যগণ, তোমরাও মনুষ্য মাত্রকেই বেদরূপ বাণীর উপদেশ প্রদান করিবে। এই কল্যাণীয় উপদেশ তোমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য তথা শূদ্র, ভৃত্য ও অরণায় অর্থাৎ অতি শূদ্রাদিকেও প্রদান করিবে। যে রূপ আমি বেদ বিদ্যার উপদেশ করিয়া বিদ্বানদিগের আত্মাতে প্রিয় হইয়া রহিয়াছি এবং যেরূপ আমি দাতা ও চবিত্রবান পুরুষের প্রিয় হইয়াছি তদ্রূপে তোমরাও পক্ষপাত রহিত হইয়া বেদ বিদ্যা শ্রবণ করিয়া সকলের প্রিয় হইবে ইত্যাদি। *

যদিও মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ স্ত্রী জাতি ও শূদ্রদিগকে বেদশাস্ত্রে অধিকার দেন নাই, তথাপি তন্ত্র শাস্ত্রে ইহাদের প্রতি যথেষ্ট উদারতা দেখান হইয়াছে। তাহারা ইহার অনুযায়ী সন্ধ্যা ও পূজা করিতে পারে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে, মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

---

* ১৮১৪ শকের পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

শূদ্রসামান্যজাতীনামধিকারোঽস্তি কেবলম্।
আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ॥ ৮।৮০।

হে দেবি! শূদ্র ও অন্যান্য সামান্য জাতির কেবল তন্ত্রোক্ত বিধিতেই অধিকার আছে। তাহার দ্বারাই তাহাদের সকল প্রকার সিদ্ধি হইবে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নাথ! তুমি বলিয়াছ যে, কলি প্রবল হইলে সমুদায় বর্ণেরই তন্ত্র অনুসারে কার্য্য করা উচিত, তবে এখন কেন ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক ক্রিয়াতে নিযোজিত করিতেছ। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলিলেনঃ—

দ্বিজাদীনাং পভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিককর্ম্মণাম্॥ ৮।৮৮।
অন্যথা শাস্তবৈম্মার্গৈঃ কেবলঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মৃত্যমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৮।৮৯।

হে পরমেশ্বরি! শূদ্র হইতে দ্বিজগণকে পৃথক করিবার জন্যই, তাহাদের তন্ত্র-বিহিত আহ্নিকের পূর্ব্বে বৈদিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, নতুবা, বৈদিক সন্ধ্যা না করিয়াও কেবল শৈব পদ্ধতির অনুসারে চলিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ইহা যে সত্য এবং বিশেষরূপে সত্য তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। মহাদেবের এই বাক্যগুলির দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, দ্বিজগণের গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই মহাদেব এবম্প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আর বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করাও তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। যে দ্বিজগণ এক সময়ে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীদের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বিহিত সম্মান প্রাপ্ত হবেন, ইহা কাহার না ইচ্ছা? আর বেদের কথা কি কহিব? যে বেদ শাস্ত্রের আদেশ সকল পালন করিয়া ভারতবাসীগণ এক সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং বলিতে কি, মানবমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে বেদ কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও বিশেষরূপে সমাদৃত, সে বেদ কি কখন উপেক্ষিত হইতে পারে?

আমরা দেখিলাম যে, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ ভবিষ্যতের অভাব বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা আরো দেখিলাম যে, তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করাতেই আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অতি হীনাবস্থায় নিপতিত হইয়াছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? বর্ত্তমান সময়ের আন্দোলনে লোকের যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের চারিদিকে হরিসভা, আর্য্যসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং অনেকে এই সকল সভায় যোগ দিয়া হিন্দুধর্ম্মপরিপোষক বক্তৃতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ

করিতেছে। শাস্ত্রগ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বহুল রূপে প্রচার হইতেছে এবং অনেকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। কিন্তু কেবল বক্তৃতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিলে চলিবে না। হিন্দু ধর্ম্ম যে এখন বাহ্য আড়ম্বরে পূর্ণ হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহার প্রকৃত অনুষ্ঠান অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তিকায় লিখিত আছে— "শিক্ষা ও অনুষ্ঠান অভাবে, আর্য্য-ধর্ম্ম আজকাল আড়ম্বরের শেষ মাত্র হইয়াছে।" * * "ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ ভারতবর্ষকে ভুলাইতে পারে না। কেবল বক্তৃতা, ঈশ্বর লাভেচ্ছা শূন্য হইয়া শাস্ত্রপাঠ, কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা ভারতীয় ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইবে না।" কি উপায়ে ভারতে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মপ্রচার হইবে, এই পুস্তিকায় লিখিত আছে—"যে ধর্ম্মভাব প্রচারিত হইলে দেখিব যে, ভারতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি আর্য্যগণের যোগ, জ্ঞান ও ধর্ম্মাচার স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের গুণগানে উল্লাস-যুক্ত হইয়াছে, "ধর্ম্মাৎপরতরং নহি" বলিয়া মানবীয় কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছে. "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ" বলিয়া নারায়ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে শিখিয়াছে, তাহাই ভারতে ধর্ম্মপ্রচার।"

উল্লিখিত পুস্তিকাখানি প্রকাশ হইবার পর কয়েক

বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই পুস্তিকাতে ১০৯টী ধর্ম্ম ও নীতিসভার একটী তালিকা সন্নিবেশিত আছে। এখন এ প্রকার সভার সংখ্যা বোধ হয় তাহার তিনগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল সভায় বক্তৃতা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন আদি হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, লোকের ধর্ম্মের প্রতি মতি হইয়াছে এবং শাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাহাদের যত্ন আছে। নিদ্রিত হিন্দু-সমাজ এখন জাগ্রত হইয়াছে। যে সমাজ কিছুকাল পূর্ব্বে অসাড় ছিল, তাহাতে এখন উদ্যমের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা যে, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকদের অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমের ফল তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। এবং এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ দিই। কিন্তু উপরোক্ত পুস্তিকালেখক যে সকল আশার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সফল হইবার এখনো অনেক বিলম্ব আছে। কেবল সভাসমিতির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে না। সময়ে সময়ে বক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে কোন বিশেষ ফল আশা করা যাইতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠান করা চাই—প্রতি গৃহে পবিত্র পরিবার সংগঠন করা উচিত—পরিবারস্থ সকলের অন্তরের সহিত ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মালোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের কথা কি কহিব, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে হতাশ হইতে হয়। অনেকেই সন্ধ্যা আহ্নিক

করেন না, এবং যাঁহারা করেন, তাঁহারা উপাসনার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই যে, যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার তাৎপর্য্য তাঁহারা অবগত নহেন। তোতা পক্ষীর মত কতকগুলি কথা আওড়াইলে কি হইবে? এই জন্যই তো দেখা যায় যে, বালকগণ উপনয়ন সংস্কার হইবার পর কিছুকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কোন ফল দেখিতে না পাইয়া তাহা ত্যাগ করে। এই যে নানা প্রকার পূজা, ব্রত এবং কয়েকটী সংস্কার হইয়া থাকে, ইহার অন্তর্গত যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহার তাৎপর্য্য অনেকেই অবগত নহে। কোন গৃহস্থের বাটীতে দুর্গোৎসব হইল, কিন্তু দেবীর উপাসনায় তাঁহার বিশেষ কোন যোগ নাই। যেন ইহা পুরোহিত মহাশয়েরই পূজা। গৃহস্থ সংকল্প করিয়াই নিশ্চিন্ত, গৃহস্থের আত্মীয় স্বজন পূজার দালানে আসিতেছে, দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছে এবং তথায় বসিয়া পূজার মন্ত্র শুনিতেছে, পুরোহিত মহাশয় কত প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা দেখিতেছে, কিন্তু সে সমুদায়ের মর্ম্ম কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। এই মহা পূজার অন্তর্গত একটী প্রার্থনা আছে, তাহাতেই কেবল সকলকে যোগ দিতে দেখা যায়। এই প্রার্থনাটী করিয়া দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। ইহা ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়

বিধ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য যে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এমন বোধ হয় না। পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করা একটা উত্তম নিয়ম। ইহা তাহাদের স্মরণ করিবার এবং তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এতদুপলক্ষে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহার তাৎপর্য্য বোধগম্য না হওয়াতে শ্রাদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অধিক কি বলিব, বিবাহ উপলক্ষে, পুরুষ স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রী পুরুষের নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়, তাহা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বলিয়া কেহই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। এরূপ ভাবে আর কতকাল চলিবে? ধর্ম্ম প্রচারকদের যে এদিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই।

আমরা হিন্দুসমাজের সমক্ষে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। আশা করি, সকলে তাহার প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিবেন, এবং যদ্যপি পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন। আমাদের শাস্ত্র অগাধ। অতি অল্পলোকেই সমগ্র পড়িতে পারেন। বিশেষতঃ সমুদায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। অনেক ধর্ম্ম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকলই বা কে পড়িয়া উঠে? যাঁহারা বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন, তাঁহারাই অধ্যয়ন করিতে পারেন। কিন্তু যুবা পুরুষদিগকে ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত

করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইলে, যুবকগণকে সৎপথ দেখান উচিত। কিন্তু লেখা পড়ার ব্যস্ততা এবং পরীক্ষারূপ বিভীষিকা তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে, এসকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার তাঁহাদের সময় কোথায়? অবকাশ পাইলে, যদ্যপি কেহ কোন কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িতে যত্নবান হয়েন, কোন্ গ্রন্থ অনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন, তাহা স্থির করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে বিষ্ণুই পরম দেবতা, এবং তাঁহারই উপাসনা করা উচিত। এইরূপে শিবপুরাণ, কালিকা-পুরাণ প্রভৃতি যে যে পুরাণ পাঠ করা যায়, সেই সেই পুরাণে শিব, কালী প্রভৃতি পরম আরাধ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আবার ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের একস্থানে প্রতিমাপূজার বিধি দেওয়া হইয়াছে এবং অপর স্থানে তাহার নিন্দা করা হইয়াছে। অবশ্য এ সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এই নিমিত্ত শাস্ত্র সকল হইতে সার সংগ্রহ করিয়া তাহা অনুবাদ সহ প্রকাশ করা উচিত। শাস্ত্র সংগ্রহ খানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। প্রথম ভাগে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার পূজার পদ্ধতি বিবৃত হইবে, দ্বিতীয় ভাগে শাস্ত্রীয় উপদেশ সকল সংগৃহীত হইবে। এই ভাগে, পিতামাতার প্রতি, স্ত্রীপুত্রের প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি এবং আপামর

সাধারণের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য সকল সন্নিবেশিত হইবে। তৃতীয় ভাগে অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশিত হইবে। এই ভাগে, দশবিধ সংস্কার, এবং ব্রত নিয়মাদির ব্যবস্থা সকল থাকিবে। প্রথম ভাগে, সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ পূজার পদ্ধতি থাকা আবশ্যক। যাঁহার যেমন মনের ভাব, যাঁহার যেমন ধারণা, তিনি সেই মতই পূজা করিবেন। মহাদেবের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কেবল তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে চলিলে লোকের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। মহাদেব ইহাও বলিয়াছেন যে, কলিকালে তন্ত্র শাস্ত্র-উক্ত পথ ব্যতিরেকে লোকের গতি নাই (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, দ্বিতীয় উল্লাস)। এই আদেশটি দ্বিজ এবং শূদ্র সকলেরই অবলম্বনীয়। এখন দেখা যাউক যে, কেবল মাত্র তন্ত্র হইতে গ্রহণ করিলে উল্লিখিত শাস্ত্র সংগ্রহের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করা যায় কি না? আমরা তৃতীয় ভাগের উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহা স্মৃতি শাস্ত্র সকল হইতে সঙ্কলিত হওয়া উচিত। মহাদেব বলিয়াছেন যে, আগম শাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। অতএব এই তন্ত্রে কি প্রকার উপদেশ আছে, তাহা আমরা আলোচনা করিব। এই তন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে এই স্তোত্রটী আছে:—

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।

নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়। ৫৯।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম। ৬০।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্। ৬১।
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ। ৬২।
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ। ৬৩।

"তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বের আত্মা স্বরূপ, অদ্বৈততত্ত্ব, মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্ব-ব্যাপী, নির্গুণ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি এক-মাত্র শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি অদ্বিতীয় বরণীয়, তুমি একমাত্র জগতের কারণ, তুমি বিশ্বরূপ, একমাত্র তুমি

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং অন্তে সংহারকর্ত্তা, তুমি একমাত্র পরম পুরুষ, নিশ্চল ও নানাবিধ কল্পনা শূন্য, তুমি ভয়ের ভয়, তুমি ভয়ানকের ভয়ানক, তুমি পাপীদিগের একমাত্র গতি এবং পাবনের পাবন। তুমি উচ্চ পদাধিষ্ঠিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ ও রক্ষকদিগের রক্ষক। হে পরেশ হে প্রভো, তুমি সর্ব্বরূপ, অবিনাশী, অনির্দেশ্য এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য, কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহ। হে সত্যস্বরূপ, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষয়, হে ব্যাপক, হে অব্যক্ততত্ত্ব, হে জগদ্ভাসকাধীশ অথবা হে জগদ্ভাসক, হে অধীশ, তুমি আমাদিগকে অপায হইতে রক্ষা কর। সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ করি, সেই এক জগৎ সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম করি। সেই তুমি সৎ একমাত্র জগতের নিধান অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ, স্বয়ং নিরালম্ব অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য, সেই তুমি ঈশ্বর, ভবসমুদ্রের পোতস্বরূপ। আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

এই উল্লাসে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মমন্ত্রই সকল মন্ত্রের সার, এবং এই মন্ত্রের উপাসকগণের অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই। ইহাতে আরো লিখিত আছে যে, এই মন্ত্র গ্রহণে তিথি, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতি গণনার নিয়ম নাই, এবং এই মন্ত্রের উপাসককে দশবিধ সংস্কার করিতে হয় না। ব্রহ্মমন্ত্রটী এই:—"ওঁ সৎ ওঁ চিৎ ওঁ একং ওঁ

ব্রহ্ম"। এই মন্ত্রের উপাসনা সম্বন্ধে এই প্রকার বিধি :—উপাসককে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে উপযুক্ত স্থলে যথোচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান এবং একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। গায়ত্রীটী এই :—পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ। পরে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া জপ সমর্পণ করত এই প্রকারে প্রণাম করিতে হইবে :—ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে। নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমোনমঃ।৩। ৭৪।

এই ব্রহ্মমন্ত্রে সকলেরই অধিকার আছে। যথা—শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরাগাণপতাস্তথা। বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ। ৩। ১৪২। অর্থাৎ—শাক্ত হউক, বা শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক, বা সৌর হউক, অথবা গাণপত্য হউক, বিপ্র হউক কিম্বা অন্য কোন জাতীয় হউক,সকলেই এই মন্ত্রে অধিকারী। স্ত্রীলোক পর্য্যন্তও এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। যথা—পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৄন্ পতিঃস্ত্রিয়ম্। মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৄন্ মাতামহোঽপিচ। ৩। ১৪৭। অর্থাৎ পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে এবং মাতামহ দৌহিত্রকে এই মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। ব্রহ্মমন্ত্রের সাধকের কোন অনুষ্ঠান বা আচারের প্রয়োজন নাই। যথা—কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য

কিম্। ব্রহ্মনিষ্ঠস্ত বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ ।৩৯৭।
অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর বৈদিকাচাবেই বা প্রয়োজন কি;
তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেই বা আবশ্যক কি? তাঁহার পক্ষে স্বেচ্ছা-
চাবই বিধি-রূপে কথিত হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এরূপ
নহে যে; ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অত্যাচাব কবিবেন। তাঁহার
স্বভাব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই প্রকার বিবৃত হইয়াছে :—

অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পবোপকারনিরতো নির্ব্বিকাবঃ সদাশয়ঃ॥ ৩। ৯৯।
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকাবী তয়োঃ সেবনতৎপবঃ॥ ১০০।
ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢবুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥ ১০১।
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যান্ন পবানিষ্টচিন্তনম্।
পবস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০২।
তৎসদিতি বদেদ্দেবী প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ॥ ১০৩।
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ১০৪

অর্থাৎ হে মহেশ্বরি! এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে
হইলে, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পবোপকার-পরায়ণ, নির্ব্বিকার-
চিত্ত ও সদাশয় হওয়া আবশ্যক। যিনি ইহার অনুষ্ঠান কবি-
বেন তিনি মাৎসর্য্য-বিহীন, দম্ভ-রহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধ-চেতা,
মাতাপিতার প্রিয় কার্য্য সাধনে ও তাঁহাদের সেবায় তৎপর

হইবেন। তিনি ব্রহ্ম-বিষয়ক বাক্য শ্রবণ ও ব্রহ্মচিন্তা করিবেন এবং ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইবেন। তিনি সংযত-চিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন এবং ব্রহ্মের বিদ্যমানতা ভাবনা করিবেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কখন মিথ্যা কথা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না এবং পরস্ত্রীগমন করিবেন না। হে দেবি! তিনি সকল কর্ম্মের আরম্ভে "তৎসৎ" উচ্চারণ করিবেন এবং পান" ভোজনাদি করিবার সময়ে "ব্রহ্মার্পণ মন্ত্র" বলিবেন। যে উপায়ের দ্বারা মনুষ্যগণের উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাই করা উচিত। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

ঈশ্বরের নিরাকার ভাব ধারণা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া এই তন্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ত্রয়োদশ উল্লাসে, পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মূল প্রকৃতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অতএব আপনি যে মহাকালীর পূজার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে সমাধা হইতে পারে? ঘটপদাদিরই রূপ আছে, কিন্তু মহাকালীর রূপ থাকা কি প্রকারে সম্ভব? ইহার প্রত্যুত্তরে মহাদেব বলিতেছেন,—

> উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
> গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্। ১৩। ১।
> শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
> প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে। ৫।

অতস্তস্যা কালশক্তে র্নিগুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায় প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ। ৭
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্॥ ৭।
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥ ৮।
গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্বানাং কালরূপেণ চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসজ্ঘো দেবেশি বাসোরূপেণ ভাষিতম্॥ ৯।
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্ব স্ব কার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্॥ ১০।
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা॥ ১১।
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যন্তি চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী॥ ১২।
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥ ১৩।

অর্থাৎ হে প্রিয়ে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। হে শৈলজে! যেমন শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেই প্রকার সর্ব্বভূতই কালীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই সেই নির্গুণা নিরাকারা যোগিজনের হিতকারিণী কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যা, কালরূপা,

অব্যয়া ও কল্যাণস্বরূপা কালীর ললাটে চন্দ্রমার চিহ্ন অমৃত প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার তিনটি নয়ন কল্পিত হইবার কারণ এই যে, নিত্য স্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কালসম্ভূত নিখিল জগৎ তিনি সন্দর্শন করেন। প্রাণী সকলকে গ্রাস করেন ও কাল দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া, সর্ব্ব প্রাণীর রুধির দেবীর রক্তবসন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। হে শিবে! সময়ে সময়ে জীবগণকে বিপদ হইতে রক্ষা এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করা তাঁহার বর ও অভয় রূপে কথিত হইয়াছে। হে ভদ্রে! রাজোগুণ জনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া, তিনি রক্তপদ্মাসনস্থিতা। সেই জ্ঞানস্বরূপা, সকলের সাক্ষিস্বরূপা মহাদেবী, মোহময়ী সুরা পান করত, ক্রীড়াকারী কালসম্ভূত জগৎকে দেখিতেছেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হিতের জন্য, উপরোক্ত গুণানুসারে সেই দেবীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, তন্ত্রশাস্ত্রে, মনুষ্যের আপামর সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি প্রকার উপদেশ সন্নিবেশিত আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে মহাদেব পার্ব্বতীকে এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানপরায়ণঃ।
যদযৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। ২৩

ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥ ২৪
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥ ২৫

অর্থাৎ, গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। সে যে যে কর্ম্ম করিবে, সমুদায়ই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। গৃহী ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিবে না, শঠতা করিবে না, এবং দেবতা ও অতিথি পূজায় তৎপর থাকিবে। সে মাতা পিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় জ্ঞান করত, প্রযত্ন সহকারে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা করিবে।

গৃহস্থো পোষয়েদ্দারান বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান।
পালয়েৎ স্বজনান বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥ ৪২
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাং পতিসেবনাম।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাং ধর্ম্মশাসনাম্॥ ৫৩

অর্থাৎ গৃহস্থ দারাকে রক্ষা করিবে, পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে—এবং আত্মীয় বন্ধুগণকে পোষণ করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। সে ধন, বস্ত্র প্রেম, শ্রদ্ধা ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাহার স্ত্রীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিবে, কখন তাহার অপ্রিয় আচরণ করিবে না। যে বালা পতিমর্য্যাদা জানে না, পতিসেবা করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞা, পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা ।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ৪৫
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্ গৃহকর্ম্মসু ।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ৪৭
এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি ।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্গৃহী ॥ ৪৮
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯

অর্থাৎ পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালন পালন করিবে। তদনন্তর ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকলগুণ শিক্ষা করাইবে। ইহার পর, পুত্র বিংশতি বৎসরের অধিক হইলে তাহাকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। পরে তাহাকে আত্মতুল্য বোধ করিয়া স্নেহপ্রদর্শন করিবে। কন্যাকেও এই প্রকারে পালন করিতে হইবে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। পরে তাহাকে ধনরত্ন সমন্বিতা করিয়া জ্ঞানবান্ পাত্রকে সমর্পণ করিবে। গৃহী ব্যক্তি, এই প্রকারে ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃপুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যগণকে পালন করিবে, এবং তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তদনন্তর গৃহস্থ স্বধর্ম্ম নিরত একগ্রামবাসী এবং অভ্যাগত ও উদাসীনদিগকে প্রতিপালন করিবে।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫
বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬

অর্থাৎ সত্য যাহার ব্রত, যাহার সর্ব্বদা দীনের প্রতি দয়া আছে, এবং কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, পরবস্তুতে যাহার অভিলাষ নাই, এবং যে জন দম্ভ ও মাৎসর্য্য বিহীন, তাহা কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার পূজার পদ্ধতি এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে কয়েকটী উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় সকলের উপলব্ধি হইবে যে, প্রস্তাবিত শাস্ত্র সংগ্রহের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ তন্ত্র শাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করা যাইতে পারে। এই সংগ্রহের তৃতীয় ভাগ সঙ্কলনে বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। সহবাস সম্মতির আইন লইয়া যে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, শাস্ত্রীয় বিধি সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অতএব সকল সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া এরূপ ব্যবস্থা সকল সংগ্রহ করা আবশ্যক যাহা হিন্দুমণ্ডলীর অনুমোদনীয় হইতে পারে। এ প্রকার হইলে আমাদের রাজপুরুষগণও বুঝিতে পারিবেন যে, এই শাস্ত্রসংগ্রহ আমাদের প্রকৃত ব্যবস্থা শাস্ত্র, এবং

তাঁহারাও ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম হইবেন না। আমাদের শাস্ত্রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং অত্যাচারীর শাসন সম্বন্ধে অনেক ব্যবস্থা আছে। তাহার মধ্যে কতক গুলি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে, ইহার অন্তর্গত কয়েকটী রহিত হইয়াছে, এবং আরো যে গুলি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, সে সকল পরিত্যাগ করা উচিত। প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর শাসন বাঞ্ছনীয় নহে। মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে।

যথা যথা নরোঽধর্ম্মং স্বয়ং কৃত্বানুভাষতে।
তথা তথা ত্বচেবাহিস্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥ ২২৯
যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্ম গর্হতি।
তথা তথা শরীরং তৎ তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥ ২৩০
কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥ ২৩১

অর্থাৎ অধর্ম্ম করিয়া যে ব্যক্তি তাহা লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সর্প যেমন ত্বক হইতে মুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও সেই রূপ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আর যে পরিমাণে পাপ করিয়া মন মন্দ কার্য্যকে নিন্দা করিতে থাকে, সে পরিমাণে সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পাপ করিয়া সন্তাপ উপস্থিত হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আর, পুনরায় এরূপ করিব না, এই বলিয়া

মন্দ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে সে ব্যক্তি স্বত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

এই প্রকার উদার ভাব অবলম্বন করত ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ন করিলে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, সন্দেহ নাই। ফল কথা এই যে, বিজ্ঞমণ্ডলীর সমক্ষে যে ব্যক্তি নিজকৃত পাপ স্বীকার করিবে এবং পুনরায় তাহা করিবে না, এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিবে, সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা সমাজের কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা ভদ্রলোকের পক্ষে কঠিন শাসন আর কি হইতে পারে? তবে যাহারা অতিশয় কদাচারী, উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা করিয়াও যাহারা মন্দকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহাদিগকে প্রথমে অল্প সময়ের জন্য সমাজচ্যুত করা কর্ত্তব্য, এবং তাহাতেও কোন ফল না দর্শিলে একেবারে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

আমরা এই প্রস্তাবটী হিন্দুমণ্ডলীর সমক্ষে ধারণ করিলাম। আশা করি যে, বাঙ্গলা দেশের বঙ্গসভা সকল প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া আলোচনা করিবেন, এবং যদ্যপি ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়া, তাঁহাদের উপর শাস্ত্রসংগ্রহের ভার অর্পণ করিবেন।